বেদেনী : অন্ধকারের গুহায়

শর্মিষ্ঠা গঙরায়

বাংলা অভিজাত সাহিত্যের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে নিঃসন্দেহে শরৎচন্দ্রের হাতে। তাঁর লেখাতেই প্রথম ভিড় করে এসেছে সাধারণ মানুষ। সাহিত্যের রাজপথ তিনি খুলে দিয়েছেন তথাকথিত শুদ্র ইতরজনের জন্য। সেটাই বাংলা ছোটোগল্পের বয়ঃসন্ধির কাল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও বাংলা সাহিত্যের সেই অন্যতম কারিগর যিনি ছোটগল্পের শৈশব উত্তীর্ণ শরীরে যৌবনের প্রলেপ লাগিয়েছেন। যিনি কৃষাণের জীবনের শরীক। কাজে ও কথায় তাদের সত্যিকারের আত্মীয়। তবে তিনি শুধু মাটির কাছাকাছি নন। উঠে এসেছেন একেবারে মাটির বুক থেকে। উত্তররাঢ়ের মাটি ও সমাজ, মন ও মানুষ তাঁর প্রতিটি লেখায় নতুন মাত্রা পেয়েছে। ডোম, বাউরী, বাগ্দী, কাহার, বেদে, সাঁওতালেরা এই সাহিত্যের নায়ক হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র আঞ্চলিক সাহিত্যের আঙিনাকে ভরিয়ে তুলতেই এরা আসে নি। জৈবপ্রবৃত্তির যে প্রাগৈতিহাসিক চেতনা মানুষের রক্তমাংসের শরীরে প্রতিমুহূর্তে ছোবল মারে তার অকুণ্ঠ প্রকাশও তাঁর অগবিত্রতা, সুন্দর-অসুন্দর এই সমস্ত চেতনার ঊর্ধ্বে। এই প্রবৃত্তিই মানুষের নিয়তি। এর হাত থেকে তার মুক্তি নেই। এই চেতনার কাছে সে অসহায়। এই আদিম চেতনাকেই তাঁর গল্পের বিষয় করেছেন তারাশঙ্কর। 'বেদেনী' গল্পটি—এই আদিম জীবনসত্যেরই একটি রূপের প্রকাশ।

"মানুষের মানে চাই-গোটা মানুষের মানে!/রক্ত, মাংস, হাড়, মেদ, মজ্জা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসাসমেত—/গোটা মানুষের মানে"—এই গোটা মানুষের মানে খুঁজতে গেলেই বোধ হয় জন্ম হতে পারে 'নারী ও নাগিনী'-র। জন্ম হতে পারে 'দেবতার ব্যাধি' কিংবা 'তারিণী মাঝি' বা 'আখড়াইয়ের দীঘি'-র। অথবা জন্ম নিতে পারে 'বেদেনী'। মানুষ পশু নয়। আবার দেবতাও নয়। সে যেন আধুনিক নৃসিংহ অবতার। সে হিরণ্যকশিপুকে বধ করে। আবার প্রহ্লাদকে বুকে টেনে নেয়। যার মধ্যে একই সাথে আছে ভয়ঙ্কর আর সুন্দর। যদিও পশুত্ব থেকে দেবত্বেই তার অভিযাত্রার শুরু, কিন্তু এই journey-এর মাঝখানে সে হয়ে পড়েছে জগতের সবচেয়ে অবোধগম্য জীব। অন্যদের কাছে। এমনকি নিজের কাছেও। তার আপাত শোভন, সুন্দর ব্যক্তিত্বের আড়ালে তার মনের একটা সর্পিল গতি আছে। তার বাঁকগুলো অত সহজে বোঝা যায় না। তার মধ্যে লুকিয়ে আছে এক আদিম বর্বরতা। এক অরুণ্, বলিষ্ঠ, হিংস্র, নগ্ন বর্বরতা। সে কোনো প্রথাকে মানে না, সংস্কারকে মানে না। সে শুধু জানে অনন্ত ক্ষিদে। শরীরের ক্ষিদে। 'বেদেনী'-রাধিকা-র এই ক্ষিদে দুর্বার। এই ক্ষিদে নিয়েই সে ছেড়েছে তার প্রথম স্বামী শিবপদ বেদের ঘর। সহবাস করেছে শম্ভু বাজিকরের সঙ্গে। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে। চাপা দিয়ে রেখেছে তার অতৃপ্ত যৌবন বাসনাকে। আবার সেই অতৃপ্ত শরীরই তাকে বাধ্য করেছে কেষ্টো বেদের সঙ্গে দেশান্তরী হ'তে। শম্ভুকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে। বড় মর্মান্তিক হিংস্র তার শেষ সংলাপ—

"টিনটা শেষ হইতেই সে দেশলাই জ্বালিয়া কেরোসিনসিক্ত ঘাসে আগুন ধরাইয়া দিল। খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরুক বুড়া পুড়্যা।"

শেষ থেকে যে গল্পকে বোঝার চেষ্টা করছি আমরা তার নায়িকা বা প্রধান চরিত্র এই বেদেনীই। এই নিষ্ঠুর, উন্মত্ত, যুবতী বেদেনী রাধিকা। গল্পের শুরুতেই তার শরীরী বর্ণনা করেছেন লেখক অনবদ্যভাবে :

"কালো সর্পিনীর মতো ক্ষীণতনু দীর্ঘাঙ্গিনী বেদেনীর সর্বাঙ্গে যেন মাদকতা মাখা; তাহার ঘন কুঞ্চিত কালো চুলে, চুলের মাঝখানে সাদা সুতোর মতো সিঁথিতে, তাহার ঈষৎ বঙ্কিম নাকে, টানা অর্ধ নিমীলিত ভঙ্গির মদির দৃষ্টি দুইটি চোখে, সূচালো চিবুকটিতে সর্বাঙ্গে মাদকতা। সে যেন মদিরার সমুদ্রে স্নান করিয়া উঠিয়াছে; মাদকতা তাহার সর্বাঙ্গ বাহিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। মহুয়া ফুলের গন্ধ যেমন নিঃশ্বাসে ভরিয়া দেয় মাদকতা, বেদেনীর কালো রূপও তেমনই চোখে ধরাইয়া দেয় একটা নেশা।"

কিন্তু রূপে মাতালই করে না, ক্ষতবিক্ষতও করে। এই রূপের আড়ালেই কোথাও লুকিয়ে আছে ক্ষুরধার তীব্রতা। একটা হিংস্র, তীক্ষ্ণ উগ্রতার আভাস। মোহমত্ত পুরুষকে যা ভুলিয়ে আনে। তারপর ছুঁড়ে ফেলে এমনকি মৃত্যুর নিশ্ছিদ্র গহ্বরে। এই দামাল যৌবনের অধিকারিণী যে রাধিকা সারাজীবন ধরে তাকে চালিত করেছে একটিমাত্র প্রবৃত্তি। তার নাম কাম। কামই রাধিকার একমাত্র চাওয়া। সে ভালোবাসা কখনও শরীর থেকে মনের পথ খুঁজে পায় নি। শরীরের মন ভালো রাখবার জন্য সে বারবার বদলেছে তার পুরুষ সঙ্গী। প্রথমে তার বিয়ে হয়েছিল শিবপদ বেদের সঙ্গে। রাধিকার স্মৃতিচারণেই আমরা তার একটা চেহারা পাই :

"শান্ত প্রকৃতির মানুষ, কোমল মুখশ্রী, বড় বড় চোখ, সে চোখের দৃষ্টি যেন মায়াধর দৃষ্টি।"

সে ছিল রাধিকার চেয়ে বছর তিনেকের বড়। অর্থাৎ যুবক। কিন্তু বেদেনীর কাছে সে ছিল নিতান্তই খেলার পুতুল, গ্রামের সকলের কাছে তার সম্মান ছিল। নিজের চেষ্টায় সে কিছু লেখাপড়াও শিখেছিল। অথচ রাধিকার কাছে সে ছিল ক্রীতদাসের মত। সে রাধিকাকে সুখে রেখেছিল। কিন্তু আরামে রাখতে পারেনি। রাধিকার দুর্বার কামতৃষ্ণাকে পরিতৃপ্তি দেবার ক্ষমতা ছিল না। এমন মানুষের সঙ্গে রাধিকা কাটাবে কি ক'রে?

এমন সময় তার জীবনে এল শম্ভু। সঙ্গে একটা বাঘ, একটা তাঁবু, আর একজন বিগতযৌবনা বেদেনী, রাধিকার অতৃপ্ত মন এই প্রথম দুলে উঠল। এই উগ্র পিঙ্গলবর্ণ, উদ্ধতদৃষ্টি, কঠোর বলিষ্ঠ প্রৌঢ় মানুষটি তাকে জিতে নিল। এক মুহূর্তে সে সব কিছু ভুলে গেল। ঘর ছাড়ল, স্বামী ছাড়ল। এমনকি শিবপদর কাতর মিনতিকে তার মনে হল কাপুরুষতা। ঘৃণায়, রাগে, তার মন ঘিন ঘিন করে উঠল। সে নির্দ্বিধায় গায়ে মেখে নিল সকলের অপবাদ।

শিবপদকে সে ভালোবাসে নি। কিন্তু বয়সের দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও শম্ভুকে ভালোবাসত, সে তার উদ্ধত পৌরুষের জন্য। এই উগ্র, দুর্বার, পুরুষ সৌন্দর্য্যের প্রতিই রাধিকার চিরকালীন দুর্বলতা। যা পুড়িয়ে মারলেও তার নারীমন তৃপ্ত হয়। যার প্রবল পাশবিক নিষ্পেষণে গুঁড়িয়ে গেলেও তার যৌবন সুখ পায়। কিন্তু শারীরিক কামনা চোরাবালির মত। তা মুহূর্তে মুহূর্তে মানুষকে অতলে টেনে নিয়ে যায়। পাঁচ বছর ধরে শম্ভু বাজিকরের সঙ্গে থেকেও কোথায় রাধিকার মনের খাঁজে তৈরী হয়ে গিয়েছিল আরও একরকম অসুখ। যার

সঙ্গে সে পরিচিত ছিল না নিজেও। পরিচিত হল তার জীবনের তৃতীয় পুরুষটির সাক্ষাতে। কেষ্টো বেদে। তার প্রবল পৌরুষ রাধিকার শরীর ও মনকে একসঙ্গে অবশ করে দিয়েছে : "একটি জোয়ান পুরুষ, ছয় ফিটের অধিক লম্বা, শরীরের প্রতি অবয়বটি সবল এবং দৃঢ়, কিন্তু তবুও দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়; লম্বা দেহ—'তেজী ঘোড়ার' যেমন মনোরম লাবণ্য ঝকমক করে—লোকটির হালকা সবল দৃঢ় শরীরে তেমনই একটি লাবণ্য আছে।"

কেষ্টোর সঙ্গে প্রথম দেখাতেই বেদেনীর অন্তরে আগুন জ্বলে উঠেছে। এ আগুন একদিকে কামনার। অন্যদিকে ঈর্ষার। কি এক অদৃশ্য জাদুকাঠির ছোঁয়ায়—এর পর থেকে রাধিকার আচরণ বড়ই দুমুখী। একদিকে কেষ্টোর প্রতি তার প্রবল ঈর্ষা, রাগ আর ঘৃণা—প্রতিযোগী বাজিকর হিসাবে। এর ফলে সে কেষ্টোকে আঘাত করতেও পিছপা হয় না। কিন্তু যতই লাগাম টানতে চায় সে, অবাধ্য ঘোড়া বশ মানে না কিছুতেই। রাধিকা হেরে যায় বার বার। তার এই পরাজিত নারীসত্তাতেই জন্ম নেয় এক প্রবল পিপাসা। যৌবনকে ভোগ করবার। নিজের অবস্থার প্রতি এই প্রথম দয়া জন্মায়, তার লেখক চমৎকার বৈপরীত্য সন্নিহিত করেছেন এখানে দুটি বাঘের অনুষঙ্গে :

"রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। তাহার মনশ্চক্ষে কেবল ভাসিয়া উঠিয়াছিল উহাদের সবল তরুণ বাঘটির কথা। .....সবল দৃঢ় ক্ষিপ্রতাব্যঞ্জক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চকমকে চিকন লোম, মুখে হাসির মতো ভঙ্গি যেন অহরহই লাগিয়া আছে। আর তাহাদের বাঘটার স্থবির শিথিল দেহ, অতি কর্কশ, খসখসে লোমগুলো দেখিলে রাধিকার শরীর ঘিনঘিন করিয়া উঠে।"

—এ ঘৃণা বাঘটার প্রতি যতটা, শম্ভুর প্রতি তার চেয়েও বেশি। তরুণ, সবল বাঘটির দৃপ্ত পৌরুষ আসলে কেষ্টোরই পরিপূরক। তার শরীরের দহন এই মানুষটাই নেভাতে পারে, এই গোপন দুর্বলতার কারণে সে কেষ্টোকে বাঁচায় পুলিশের হাত থেকে। আর শম্ভুর হাতে মারও খায় বিনা প্রতিবাদে।

বিচিত্র মানুষের মন। বিশেষত আধুনিক মানুষের মনের অন্দরমহল। প্রতিটি অনুভূতি সেখানে এমনভাবে মিশে থাকে যে বোঝা যায় না তাদের সূক্ষ্মতম পার্থক্য। রাধিকার জীবনে ঈর্ষা আর প্রেম—একই অনুভূতির ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। কেষ্টোর সার্কাস বা 'বিড়ালীর মত গাল মোটা স্থবিরার মত স্থূলাঙ্গী মেয়েটা'-কে তার যে ভালো মনে হয়—এর কারণ এই ঈর্ষাই—"আজ সে বেণী বাঁধিল না, আপনাদের সকল প্রকার দীনতা ও জীর্ণতার প্রতি অবজ্ঞার ক্ষোভে তাহার যেন লজ্জায় মরিতে ইচ্ছা হইতেছিল।" জনতা যখন স্রোতের মত কেষ্টোর তাঁবুতে ঢুকেছে প্রবল ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠেছে রাধিকার মনে। সে আর শম্ভু মিলে পরিকল্পনা করেছে—রাতে আগুন লাগিয়ে দেবে কেষ্টোর তাঁবুতে।

রাধিকার সংকল্প দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। গভীর রাতে সে জেগে ওঠে নিশাচরী বাঘিনীর মত। সর্বাঙ্গে ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসা। থমথমে অন্ধকারে সে সঙ্গী করতে চায় শম্ভুকে। কিন্তু—"শম্ভুকে ডাকিতে গিয়া দেখিল, সে শীতে কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহার উপর ক্রোধে ঘৃণায় রাধিকার মন ছি ছি করিয়া উঠিল। অপমান ভুলিয়া গিয়াছে, ঘুম আসিয়াছে।" এই বিতৃষ্ণাকে বুকে নিয়েই সে ক্রূর হিংস্র সাপিনীর মত উপস্থিত হয়েছে

কেষ্টোর তাঁবুর বাইরে। সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে ঢুকেছে তাঁবুতে। তারপর দেখেছে নিদ্রারত কেষ্টোকে। ঘুমন্ত তরুণের দামাল পৌরুষে একমুহূর্তে ওলোটপালোট করে দিয়েছে বেদেনীর সমস্ত কষা ছক। বুকের মধ্যে কোথা থেকে জমা হয়েছে একরাশ অসুখ—কামনার অসুখ—অতৃপ্তির যন্ত্রণা। এবং তার উদ্দীপন বিভাব শম্ভুর বিপরীতে ঘুমিয়ে থাকা কেষ্টোর ছবি—

"কেষ্টোর কঠিন সুশ্রী মুখে কি সাহস। উঃ বুকখানা কি চওড়া, হাতের পেশীগুলো কি নিটোল, তাহার আশেপাশে ঘোড়ার খুরের দাগ—ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে কেষ্টো নাচিয়া ফেরে। ঐ যে কাঁধে সদ্য ক্ষত চিহ্নটা-ওই দুর্দান্ত সবল বাঘটার নখের চিহ্ন।"

আহত বাঘের মত কেষ্টোর এই দুর্দান্ত শরীরী আবেদনে অবশ হয়ে গেছে রাধিকার শরীর ও মন। সে ভুলেছে সংকল্প। ভুলেছে প্রতিহিংসা, লেখকের ভাষাতেই—

"রাধিকার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিয়া উঠিল, যেমন করিয়াছিল শম্ভুকে প্রথম দিন দেখিয়া বলিষ্ঠ বাহুর ঘেরাটোপে। আবার এক নিরুদ্দেশের পথে তার অভিযান, সঙ্গী কেষ্টো। তার বর্তমান প্রেমিক। তার বর্তমান নাগর। শম্ভু এখন অতীত। অকেজো অতীত। তাই তাকে নিশ্চিহ্ন ক'রে এগিয়ে চলে বেদেনী।

মানুষ আসলে এক অভিজাত পশু। তাই জগতের দুটি মৌলিক চাহিদা তাকে একই রকম ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথমটা পেটের প্রয়োজনে নারীকে টেনে নিয়ে যেত গুহায়। সভ্যতার সিঁড়ি চড়ে আজ সে পরিশীলিত মোড়কে নিজেকে মুড়েছে। কিন্তু তার মনের অন্ধকারে আজও বেঁচে আছে সেই পশু। প্রবৃত্তির সেই যন্ত্রণা মেটাতে সে নিজেকে উলঙ্গ ক'রে দেয় প্রতি মুহূর্তেই। সেখানে কোনো সংস্কারের প্রশ্ন ওঠে না। উঠতে পারেও না। তাই তারাশঙ্করের এই গল্পের বেদেনী স্বৈরিণী কিনা এ বিতর্কে আমাদের জড়াতে ইচ্ছে করে না। কেষ্টোর সঙ্গে ও যে ঘর বাঁধতে পারবে না এরকম একটা ইঙ্গিত গল্পের শেষে থেকে যায়। কারণ প্রবৃত্তি কোনো বন্ধন চায় না। চায় শুধু নিবৃত্তি। মানুষের মনের কোনো একটা অন্ধকার কোণে যে আর একটা অসুখী মানুষ বাস করে তারাশঙ্কর তাকেই তুলে এনেছেন পাঠকের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সামনে। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্বপ্নে যে মানুষ ধরা পড়েছে সে রসিক মানুষ। শরৎচন্দ্রের কল্পনার মূলে আছে প্রেমিক মানুষ। কিন্তু তারাশঙ্করের মানুষেরা প্রখর ভাবে জৈবিক। প্রবল ভাবে অর্থনৈতিক। আর এদের সম্মিলনে গড়ে ওঠা এক সামাজিক মানুষ। নৈতিকতার শক্ত দেওয়াল তাদের চারিদিকে নেই। আদর্শমানবতার বিগ্রহ সেখানে পুজো পায় না। তারা শুধু এক আদিম শক্তির বশীভূত মাত্র। এই সৃষ্টির মূলীভূত সে শক্তি। 'বেদেনী' গল্পটি সেই শক্তিরই প্রকাশ।